গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

উপন্যাস রচনার মূলে রয়েছে প্রাচীন মহাকাব্য। বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনীতে সর্বদাই পাঠকের মন আকৃষ্ট হয়। সমাজের সঙ্গে উপন্যাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে বলে উপন্যাস হয় মানুষের বাস্তব জীবনের ছবি। বাংলা উপন্যাসে প্রথম দিকে ছিল নক্‌শা জাতীয় রচনা — এর যথার্থ সূচনাকাল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। বাস্তব জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে, ঘটনার ধারাবাহিক ও শিল্পী-মনের সচেতন উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, এক সম্পূর্ণ, অন্তঃসংগতি-বিশিষ্ট কাল্পনিক ছবিতে সংহত হয়। এটাই সজ্ঞান উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর। নতুন উপন্যাসে প্রধানত দুইটি দিক লক্ষ করা যায়— প্রথমত, উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সূচনা ও পরিণতি; দ্বিতীয়ত, বাস্তবতা প্রধান সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে এক নূতন গভীরতা ও ভাবসমৃদ্ধির সঞ্চার।

বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উপন্যাসের প্রসার ঘটেছে। প্যারিচাঁদ মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাস রচনার গোড়াপত্তন করলেও যথার্থ উপন্যাস রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমের পর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নতুন যুগের অগ্রগামী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের বিচিত্র ঐশ্বর্যে ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিয়ে পাঠক সমাজ নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুযায়ী খুশি হয়েছিলেন, তখন বাংলার সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের উদয় হয়। ১৯০৩ সালে 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প 'মন্দির' লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' নামে তাঁর লেখা একটি বড় গল্প প্রকাশিত হলে পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি পড়ে দেখলেন, এই গল্পটির লেখক অসাধারণ শিল্পী। ক্রমে অপরিচয়ের মেঘ কেটে গিয়ে শরৎচন্দ্র স্নিগ্ধ আলোক নিয়ে রবির পাশেই গিয়ে উদিত হলেন। তিনি বাংলাদেশের সাধারণ নরনারীর জীবনকেই তাঁর লেখার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার বঞ্চিত, নিপীড়িত নারীদের কথা তিনি হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করেছেন। গৃহবন্দী নারীদের তিনি দেখেছিলেন। তাদের অসহায় অবস্থা সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্যই যেন তিনি কলম ধরেছিলেন।

দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ের লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বেশকিছু উপন্যাসে সরাসরি বাঙালি অন্তঃপুর, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে এলেন। এই সমাজ প্রাক্-প্রথম মহাযুদ্ধ পর্বের। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে জমিদারের প্রাধান্যের স্বীকৃতিস্বরূপ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে জমিদারদের কথাও উঠে এসেছে। জমিদার ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান কি

ছিল তা স্পষ্ট হয়েছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সৃষ্ট নারী চরিত্রের মধ্যে রয়েছে স্নেহশীলা মাতা, বৌদি, কন্যা, গৃহবধূ, গৃহকর্ত্রী ও প্রেমিকা। এই সব নারীরা বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অবস্থান করেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়। তাঁর উপন্যাস সমূহের মধ্যে পরিবারভিত্তিক উপন্যাসে, সমাজ-অননুমোদিত প্রেম সম্পর্কিত উপন্যাসে এবং রাজনৈতিক উপন্যাসে নারীর অবস্থান কি ছিল তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুসংহত রূপ দেবার জন্য আমরা সমগ্র বিষয়টিকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি—

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাজন।

তৃতীয় অধ্যায় : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার-ভিত্তিক উপন্যাসে সময় ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান অন্বেষণ

চতুর্থ অধ্যায় : সময় ও সমাজের নিরিখে সমাজ অননুমোদিত প্রেম সম্পর্কিত শরৎ উপন্যাসে নারীর অবস্থান অন্বেষণ।

পঞ্চম অধ্যায় : সময় ও সমাজের নিরিখে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাসে নারীর অবস্থান অন্বেষণ

উপসংহার :

প্রথম অধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়

যেখানে নরনারীর চিত্তে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-জটিলতার মধ্যে দিয়ে সমাজের প্রতিফলন হয় সেখানে জীবন্ত সমাজ উপলব্ধি করা যায়। এই সমাজের অগ্রগতি বা পশ্চাৎপদতার সঙ্গে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ জড়িয়ে একাত্ম হয়ে ওঠে। বাংলা উপন্যাসে এই বিষয়টি শরৎচন্দ্রই প্রথম দেখাতে পেরেছিলেন বলে মনে করা হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। এই দেবানন্দপুর গ্রামটি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গৌরব মহিমায় অবস্থিত। দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের মাত্র অল্প কয়েকটি বৎসর অতিক্রান্ত

হয়েছিল। তাঁর শৈশবকাল ও পাঠশালার পর্ব এই গ্রামেই সম্পন্ন হয়।

শরৎচন্দ্রের মাতুলালয় ছিল হালিশহরে। তাঁর মাতামহ ভাগলপুরের কাছারিতে চাকরি করতেন। শরৎচন্দ্রকে সেখানেই চলে যেতে হয়। সেখান থেকেই তিনি এন্ট্রান্স পাশ করলেও অর্থাভাব পড়াশুনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে বিভূতিভূষণ ভট্ট নামে এক বন্ধুর বাড়ির সাহিত্যচর্চা তাঁকে আকৃষ্ট করে। এখান থেকে তাঁর লেখালেখি শুরু হয়। শরৎচন্দ্র ও তাঁর আড্ডাধারী সঙ্গীদের রচনা 'ছায়া' নামে এক হাতে লেখা পত্রিকায় প্রকাশ হত। শরৎচন্দ্রের রচিত প্রথমদিকের গল্পগুলো এই পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' নামে গল্পটি ১৩০৯ বঙ্গাব্দে 'কুন্তলীন' পুরস্কার পায়। 'অনিলাদেবী' ছদ্মনামে তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'নারীর মূল্য', 'কানকাটা' ও 'গুরুশিষ্য' (১৩১৯-১৩২০) 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বড়দিদি' তাঁর সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল— 'বিরাজ বৌ', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই', 'পল্লী সমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'দত্তা', চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'শেষ প্রশ্ন', 'পথের দাবী' প্রভৃতি। শরৎচন্দ্র বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ফসল হিসাবে তিনি প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখেছেন। এই পর্যায়ের প্রবন্ধের মধ্যে পরে 'স্বদেশ ও সাহিত্য', 'তরুণের বিদ্রোহ' এবং উপন্যাস হিসাবে 'পথের দাবী'র নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সদস্য হন। শরৎচন্দ্র নামের উজ্জ্বল নক্ষত্রটি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি নশ্বর দেহ ত্যাগ করে পাঠকের হৃদয় আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই অধ্যায়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র জীবন ও সাহিত্য পরিচয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাজন

শরৎচন্দ্র মানবমনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কথা লিখেছেন উপন্যাস সমূহে। তাঁর লেখার একটি প্রধান বিশেষত্ব হল সমাজশক্তির প্রভাব শুধু বাইরের শক্তি হিসাবে নয়, তা মানুষের মনের মধ্যেই বাসা বেঁধেছে। নারীর মনে এই দুটি শক্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত যে দ্বন্দ্ব চলে তাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন।

নারী হৃদয়ে প্রেমলিপ্সার সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্বকে তিনি দেখিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রের মধ্যে। শরৎচন্দ্র অনেক প্রণয়ের কাহিনী রচনা করেছেন, এছাড়া পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের কথাও উপন্যাসগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজের যেসব ক্রুর, কৌশলী ধর্মধ্বজী ব্যক্তি সামাজিক ও পারিবারিক জীবন অশান্তিতে ভরে দেয় তাদের কথাও দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশের কিছু কিছু মেয়েও বাইরের জগতের সম্পর্কে জেনেছে। তারা পরাধীনতার দুঃখ বুঝেছিল। এই নারীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই দেশের মুক্তি কামনায় যারা নিজের স্বার্থত্যাগ করেছিলেন তাদের কাহিনীও লেখক বাস্তব রূপ দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের রচিত উপন্যাসগুলির বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির নাম ও প্রকাশ কাল উল্লেখ করে সমাজ বাস্তবতার আলোকে বিষয় বৈচিত্র্য অন্বেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। শরৎচন্দ্রের লেখা উপন্যাসগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছি।

১. পরিবার ও সমাজ ভিত্তিক উপন্যাস— 'বিরাজ বৌ', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই', 'পল্লী সমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'দত্তা', 'বামুনের মেয়ে', 'দেনাপাওনা', 'নববিধান' এবং 'বিপ্রদাস'।

২. সমাজ অননুমোদিত প্রেম ভিত্তিক উপন্যাস— 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' (চারটি পর্ব), 'গৃহদাহ' এবং 'শেষ প্রশ্ন'।

৩. রাজনৈতিক উপন্যাস— 'পথের দাবী'।

এই তিনটি ভাবনার আলোকে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে নারীর সামাজিক অবস্থানকে নির্ণয় করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার-ভিত্তিক উপন্যাসে সময় ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান অন্বেষণ

গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবন লেখক শরৎচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। এই মানুষের কথাই তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁর রচনাকালের প্রথমদিকের উপন্যাস সমূহের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন পারিবারিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত। সামাজিক নিয়ম, ধর্ম, আর্থিক অভাব মানুষের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলে ও তার করুণ পরিণতির কথাই এইসব উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্র পল্লীর মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। গ্রামবাংলার নারীদের দুঃখ, লাঞ্ছনা, অবহেলা তিনি প্রত্যক্ষ

করেছিলেন। ফলে তাদের অবস্থা প্রকাশ্যে আনার জন্যই তিনি কলমের সাহায্যে নিয়েছিলেন। পরিবার ও সমাজভিত্তিক উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় একান্নবর্তী পরিবারের সমস্যা, জাতিভেদ ও কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা-মাতার সমস্যা, দাম্পত্য অসমন্বয়ের সমস্যা, পদস্খলিতা নারীর সমস্যা। বাংলার পল্লীসমাজে কুসংস্কারও সতীত্বের অন্ধবিশ্বাস এবং সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে কীভাবে নারীমন হত্যা করা হত তার দৃষ্টান্ত। কৌলিন্যপ্রথার বলি হয়েছে বহুনারী। মানুষকে স্বর্গে পাঠানোর চিন্তায় সমাজপতিদের নিষ্ঠুর অত্যাচার, নির্যাতন এসবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ শরৎসাহিত্য। বিশেষ করে নারীর নারীত্ব ও তাদের সামাজিক মর্যাদা কিরূপ ছিল তা লেখকের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। লেখক সমাজের রীতিবিধানকে অতিক্রম করতে পরেননি। তবে সমাজের সে বিধি সংস্কার মানুষকে দুঃখ দেয়, মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে সেইসব সংস্কার ও বিধানের প্রয়োজনীয়তা কতটা তাকেই তিনি তাঁর রচিত পরিবারভিত্তিক উপন্যাসে যথা— 'বিরাজ বৌ', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই', 'পল্লী সমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'দত্তা' ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্যে অঙ্কিত করেছেন। এই উপন্যাসগুলিতে বর্ণিত নারীচরিত্রের মধ্যে তা দেখাতে চেয়েছেন। এইসব উপন্যাসের মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ নারীচরিত্রগুলো আলোচনার মাধ্যমে তাদের সামাজিক অবস্থানের জায়গাটি বিশ্লেষণ করে নারীর অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

সময় ও সমাজের নিরিখে সমাজ অননুমোদিত প্রেম সম্পর্কিত শরৎ উপন্যাসে নারীর অবস্থান অন্বেষণ

শরৎসাহিত্যের সাফল্য প্রসঙ্গে সমালোচকরা যে বিশেষ বিষয়গুলি নির্দেশ করে থাকেন তার প্রধান একটি দিক উপন্যাসে সমাজ-অননুমোদিত প্রেম। সমাজবিগর্হিত নিষিদ্ধ প্রেমকে তিনি অনেকগুলি উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন। তাঁর লেখা সমাজ অননুমোদিত প্রেম সম্পর্কিত উপন্যাসগুলি যথাক্রমে 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত' (১ম, ২য়, ৩য় ৪র্থ পর্ব), 'গৃহদাহ' ও 'শেষপ্রশ্ন'। এইসব উপন্যাসের নারীদের মধ্যে রয়েছে সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি, নিরুদিদি, অভয়া, কমল প্রমুখ। সমাজে নারীরা কীভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং শেষে সমাজের বাইরে এক কোণে তাদের স্থান হয় তার কথা উঠে এসেছে এইসব নারীদের চরিত্র বর্ণনায়। যেমন সাবিত্রী পতিতালয় থেকে ফিরে এসে ঝি এর কাজ করেছে, সতীশের সঙ্গে সে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। অসুস্থ সতীশকে

সেবা সুশ্রুষা করে সুস্থ্য করল কিন্তু সে সমাজে স্থান পেল না। কিরণময়ী পুরুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে শেষে উন্মাদগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। অন্নদাদিদির স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা ও ত্যাগ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই অধ্যায়ে উল্লেখিত উপন্যাস সমূহের নারীচরিত্রগুলো আলোচনা করে তার আবহে সময় ও সমাজের নিরিখে সমাজ অননুমোদিত প্রেম সম্পর্কিত শরৎউপন্যাসে নারীর অবস্থান কি ছিল তা অন্বেষণের চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

সময় ও সমাজের নিরিখে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাসে নারীর অবস্থান অন্বেষণ

শরৎচন্দ্রের লেখা 'পথের দাবী' উপন্যাসটিকে একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাসের পর্যায়ে ধরা হয়। এটি দেশপ্রেমমূলক রাজনৈতিক উপন্যাস। পরাধীনতার গ্লানি ও দুঃখবোধ লেখককে ভাবিয়ে তুলেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত 'পথের দাবী'। দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে যুবসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রাম করেছে তারা। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীরাও যে পিছিয়ে ছিল না তার প্রমাণ 'পথের দাবী' উপন্যাস। এই উপন্যাসে প্রধান দুটি নারী চরিত্র সুমিত্রা ও ভারতী। এরা দুজনেই সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারা যেমন দেশের মুক্তির জন্য লড়াইয়ে সামিল হয়েছে তেমনি নারীজীবনের আশা আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করতেও সচেষ্ট ছিল। প্রেমাস্পদের জন্য সর্বস্ব দিয়েও এরা বঞ্চিত হয়েছে প্রেমিকের ভালোবাসা থেকে। ভারতী অপূর্বের বিপদের সময় তার কাছে থেকে সাহায্য করলেও অপূর্ব তার মর্যাদা দিল না। অপরদিকে সুমিত্রা সব্যসাচীর কাজে সাহায্য করেছে কিন্তু শেষে সব্যসাচী তার থেকে দূরে চলে যায়। নারীর যে প্রধান পাওয়া সংসারজীবন ও মাতৃত্ব এসবের কিছুই তারা পেল না। সমাজের জন্য, দেশের জন্য বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যে নারীরা যুক্ত ছিলেন তাদের ত্যাগ, সেবার ব্রতের সঙ্গে নিজেদের প্রেমাস্পদের কাছ থেকে ভালোবাসায় বঞ্চিত হয়েছে এই নারীরা। 'পথের দাবী' উপন্যাসের নারীচরিত্রসমূহ আলোচনা করে সেই আলোকে সময় ও সমাজের নিরিখে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাসে নারীর অবস্থান অন্বেষণের চেষ্টা করেছি।

উপসংহার

আজকের দিনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যুগের অনেক ব্যবধান। আজকের নারীরা সমাজ সংস্কারের নিয়মের গণ্ডীতে আর বাঁধা নেই। নারী শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং পাশ্চাত্য প্রভাবে নারীরা এখন সমাজের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন কাজে যুক্ত হয়েছে। দেশের আইনে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় এখনো নারীরা স্বাধীন নয়। তারা সমাজে তাদের ত্যাগের, কর্মের যোগ্য সম্মান পায় না। নারীর অগ্রগতির উচ্চ আসনে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারী স্থান পেয়েছে। আর বেশিরভাগ নারী হয় অবহেলিত, প্রতারিত ও বঞ্চিত। দাম্পত্য জীবনে অনেক নারী সুখী হতে না পেরে সংসার ছেড়ে পিত্রালয়ে ফিরে যায়। আবার অনেক নারী পুরুষে মিথ্যা ভালোবাসার প্রলোভনে পা দিয়ে শেষে সমাজের বাইরে পতিতালয়ে তাকে জীবন কাটাতে হয়। বিধবাদের জীবনও কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। অল্পবয়সের বিধবাদের প্রতি অনেক পুরুষের নজর থাকে। সমাজও তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাতে তৎপর থাকে। বিধবাদের বিয়ে করতে যেমন অনেক যুবকদের আপত্তি থাকে তেমন বিধবা মেয়েরাও অনেকে সংস্কারবশত দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করে না। সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে নারীদের অগ্রগতিও অব্যাহত রয়েছে। তবুও এখনও বাংলার গ্রাম ও শহরে শরৎচন্দ্রের চিত্রিত নারী বিরাজ, জ্ঞানদা, অভয়া, সাবিত্রী, কিরণময়ী রাজলক্ষ্মী— এদের মত নারী এখনও দেশের সর্বত্রই চোখে পড়ে।

আজকের নারীরা সাংসারিক জীবনকে পরিবর্তন করে নিয়েছে। পারিবারিক বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে পেরেছে। দেশ, সমাজ, সংসার কোথাও তাদের অবদান কম নয়। সকল কর্তব্য নারীরা দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে চলেছে। তবুও বহুক্ষেত্রে তারা তাদের যোগ্য সম্মান পায় না। এ যুগের নারীরা আরো একটু সম্মান আশা করে।

Bani Ghosh 16/02/2023

গবেষকের স্বাক্ষর

Manjula Bera 16/02/2023

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal